# অধরা- আতিক রহমান

গ্রামের নাম রসুলপুর। গ্রাম পেরুলেই ছোট নদী, তারপর ধু ধু মাঠ ও শষ্য ক্ষেত, তারই বুক চিরে এঁকে বেঁকে ডিস্ট্রিক বোর্ডের কাঁচা রাস্তা সেই সুদূর নীলে গিয়ে মিশে গেছে। খেয়া নৌকাই নদী পারাপারের একমাত্র ব্যবস্থা। মফস্বল শহর থেকে প্রায় বিশ কিলোমিটার দূরে রসুলপুর গ্রাম। আলাল আর বেলাল এই গ্রামের বাসিন্দা। ওরা দুই ভাই, শেফালীর ছেলে ও ওয়াজেদ শানার নাতী। শেফালী ওয়াজেদ শানার একমাত্র মেয়ে। অল্প বয়সে বিধবা হয়ে দুই শিশুপুত্রকে নিয়ে বাপের ঘরে। ওয়াজেদ শানা সেই ব্রিটিশ আমলের ম্যাট্রিক পাশ, প্রাইমারী স্কুলের শিক্ষক। শিক্ষকতার আয় আর ছেলের পাঠান সামান্য টাকায় মেয়ে আর নাতিদ্বয়কে নিয়ে টানাটানির সংসার। তবে একসময় সে ধনাঠ্য ছিল। কয়েক একর জমির উপর দাঁড়িয়ে ছিল ওয়াজেদ শানার বাড়ী। বাড়ীর দরজায় গম্বুজকরা পাকা মসজিদ, পাশেই মক্তব, প্রসস্থ কাছারী- পারিবারিক মুসাফিরখানা। বাড়ীর সামনে শান বাঁধান দিঘী। খরায় এই দিঘীর জলেই সাত গ্রামের মানুষের খাবার পানির ব্যবস্থা হতো। দীঘির কোল ঘেঁষে তিন চার ঘর ধোপা নাপিত- নিম্নবিত্ত পরিবারের বাস। এরা শানা বাড়ীর আশ্রিত; চাল, ডাল, নুন, তেল ঝালের যোগান দাতা শানা'রা। বিনিময়ে শানা'দের সেবাদান করাই ছিল এদের প্রাথমিক দায়িত্ব।

দুর্ভাগ্য সেই শানা বাড়ী আজ আর নেই। মেঘনার করালগ্রাসে আজ তা নদীর গহ্বরে। যেদিন শানা বাড়ীর গম্বুজকরা পাকা মসজিদখানা দিনের আলোয় ধীরে ধীরে মেঘনার অতলে তলিয়ে যাচ্ছিল; সারা গ্রামের মানুষ অসহায়ের মত দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছিল আর অবুঝ শিশুর মতো কাঁদছিল। নদী ভাঙ্গনে নিঃস্ব হন ওয়াজেদ শানা। উপায়ন্তর না পেয়ে অবশেষে শ্বশুরের গাঁয়ে এসে ঠাঁই। শ্বশুর সুজামিয়া কাণ্ডজী তখন জীবিত। নদী সিকস্তি জামাতাকে বাড়ী করার জন্য অল্প কতটুকু জমি দিয়েছিলেন। সেই থেকে ওয়াজেদ শানা রসুলপুরে। নুতন এই বাড়ীর নামও শানা বাড়ী, তবে এতে নেই শাবক সেই শানা বাড়ীর জৌলুস। নেই ধোপা, নেই নাপিত, নেই সেই শাঁন বাঁধান দিঘী। এটি একটি সাদামাটা গ্রাম্য বাড়ী। চৌচালা একখানা টিনের ঘর, ছিমছাম একফালি উঠান, বাড়ীর চারপাশে ফলফলাদির গাছ, পিছনে পুকুর তাতে মেয়েদের স্নানের জন্য আলাদা করে ব্যবস্থা। বাড়ির সামনে ছোট্র ছনের তৈরী কুঁড়েঘর; পাশে বাঁশঝাড়। মাটির পাঁচিল দিয়ে ঘেরা বাড়ীর চারপাশ। পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার ছোঁয়া বাড়ীর সর্বত্র; এটাই শানা বাড়ির আলাদা একটা বৈশিস্ট্য।

কাঁচের ফ্রেমে বাঁধান আগ্রার তাজমহল বারান্দা ঘরের শোভা। বড় মাছের আঁশ, জড়ি আর চুমকি দিয়ে গড়া ভালবাসার এই প্রতীক তাজমহল- তাতে রঙিন সুঁতোয় বড় বড় হরফে লেখা –

"প্রাণহীন শ্বেত পাথরের গড়া আগ্রার তাজমহল,
বাহিরে যার সম্রাট শাজাহান অন্তরে মমতাজমহল"।

শাবক আমলের সেই দেওয়াল ঘড়িটা আজও প্রতি ঘন্টায় ঢং – ঢং - ঢং আওয়াজ তুলে ওয়াজেদ শানার পুরানো বনেদি অস্তীত্বের একটা নিস্ফল জানান দেয়। বারান্দা ঘরে পরিপাটি বিছানা, উপরে সাদা কাপড়ের সামিয়ানা, তাতে লাল শালুর ঝুলন দেয়া বর্ডার এবং মাঝখানে গোল নকষা করা কারুকাজ। বিছানায় প্রমান সাইজের গোটা দুই কোল বালিশ। খাটের নীচে কাঁসার বদনায় অজুর পানি, পাশে জলচৌকি এবং কাঠের একজোড়া চপ্পল। এসকল ব্যবস্থা শানা বাড়ীর সেই শাবকি আদলে।

ওয়াজেদ শানার ছেলে আলম গ্রামের স্কুল থেকে ম্যাট্রিক পাশ করে চিটাগাংয় ষ্টীল মিলে কাজ করে। টানাটানির সংসারে অল্প বয়সে কাজে নেমে পড়তে হয়ছে তাকে। পড়াশুনা বেশী দূর এগোয়নি। মাসে মাসে বাবাকে কিছু টাকা পাঠায়। শেফালীও পড়াশুনায় ভাল ছিলো, কিন্তু পড়াশুনা তারও বেশী দূর এগোয়নি। গ্রামের স্কুল থেকে মেট্রিক পাশ করে বাড়িতে। তাই বলে মেয়ের জ্ঞান অর্জনের জন্য ওয়াজেদ শানার চেষ্টার কমতি ছিল না। শহর থেকে বই ম্যাগাজিন কিনে এনে দেন মেয়েকে যাতে মেয়ে বিদুষী হয়। এর পাশাপাশি চলেছে মেয়ের জন্য উপযুক্ত পাত্র খোঁজার পালা। শেফালী দেখতে অনিন্দ সুন্দরী না হলেও চোখে পড়ার মত।

---

আতিক রহমান, সিডনি

গায়ের রঙ শ্যামলা, টানা টানা চোখ, গড়ন ভাল। উপযুক্ত পাত্র পেতে বেগ পেতে হলো না ওয়াজেদ শানার। ছেলে গদাইপূরের, বিএ পাশ। পূর্ব-পাকিস্তান রেলওয়েতে চাকুরী করে। রামগঁড় রেলওয়ে স্টেশনের স্টেশনমাস্টার। দেখতে সুদর্শন, বেতন ভাল। একদিন ঘটা করে শেফালীর বিয়ে হয়ে গেলো। ক'দিনের মাথায় জামাই মেয়েকে নিয়ে চলে গেলো রামগঁড়ে। বিয়ের পাঁচ বছরের মধ্যে শেফালীর কোল জুড়ে এলো আলাল আর বেলাল। সুখেই কাটছিল শেফালীর দিনগুলো। কিন্তু বিধিবাম; বিয়ের ছয় কি সাত বছরের মাথায় সামান্য এক অসুখে পড়ে জামাই মারা গেল। আলালের বয়স তখন আড়াই কি তিন আর বেলাল সবে এক পা দু পা করে হাটি হাটি করছে। বড়ই দুর্ভাগ্য শেফালীর; মাত্র পঁচিশ বছর বয়ষে বিধবা হয়ে ফিরে এলো সে বাপের ঘরে। ছেলেমেয়ের সুখের কথা ভেবে ওয়াজেদ শানা সারাটা জীবন বিপত্নিক, অথচ সেই অতি আদরের মা হারা মেয়ে আজ অল্প বয়ষে বিধবা হয়ে তার ঘরে। শেফালীকে আবার বিয়ে দেয়ার জন্য পরামর্শ দিয়েছিলেন অনেকে। বাবাও চেয়েছিলেন মেয়ের আবার বিয়ে হোক। কিন্তু শেফালীর এক কথা - "না"। সে যেভাবে আছে- বেশ আছে। ওয়াজেদ শানা এনিয়ে মেয়ের উপর আর কোন জোর খাটাননি। সেই থেকে ছেলে আলাল আর বেলালকে নিয়ে শেফালী বাপের ঘরে-রসুলপুরে। দুই সন্তানের উজ্জল ভবিষ্যতই এখন শেফালীর জীবনের একমাত্র কামনা, একমাত্র স্বপ্ন। আলাল আর বেলালই তার আশার আলো।

দিন যায় রাত আসে, দিন গড়িয়ে মাস, মাস গড়িয়ে বছর। এভাবেই কালের চাকায় পাড় হয় শেফালীর জীবনের অনেকগুলো বছর। প্রকৃতির অমোঘ নিয়মে শেফালীর নানা সুজামিয়া কাগুজী এবং বড় বড় সব মামারাও একে একে গত হয়েছেন পৃথিবী থেকে। সনাতন পদ্ধতির কাগজ তৈরীর জাদুকর এই "কাগুজী" পরিবার এখন আর সেই কাগজের ব্যবসায় নেই। মেশিনে কাগজ তৈরীর কৌশল আবিষ্কারের সাথে সাথে অনেক পেশার মত কাগুজী পেশারও অবসান ঘটে। এই কাগুজী বাড়ীর কর্তাব্যাক্তি এখন লালুমিয়া কাগুজী। সে সুজা কাগুজীর বড়ছেলের ঘরের নাতি, সম্পর্কে শেফালির মামাতো ভাই; বাজারে দোকান জমি জমা সব মিলিয়ে গ্রামের অবস্থা সম্পন্ন গেরস্থ। ছোকানুর লালুমিয়ার একমাত্র মেয়ে। সে আলাল আর বেলালের খেলার সাথী। আলাল, বেলাল আর ছোকানুর বাড়ীর পাশের স্কুলে পড়ে। ছোকানুর ও বেলাল একই ক্লাসে আর আলাল ওদের তিন ক্লাস উপরে। ওরা তিনজন রোজ স্কুলে যায় একসাথে। ওরা খেলার সাথী। দীঘির পাড়ে সারি সারি তাল গাছ, তার পাশে গাছের ডালে স্বর্নলতার ঝোঁপ; তাতে ঘুঘু পাখি বাসা বেঁধেছে। ঘুঘু কুঁস টেনে বাসা বেঁধেছে, কখন ডিম পাড়লো, কখন ডিম ফুটে বাচ্চা হয়েছে; এনিয়ে ওদের শিশুশূলভ চপলতার অন্ত নেই। স্কুল থেকে ফিরে বেঁতঝার থেকে বেঁতফল, কাঁঠালের মূছি, গাছের কাঁচা আম তাতে লবণ মরিচ তেঁল মাখিয়ে খাওয়া- এ ছিল আলাল, বিলালের আর ছোকুনুরের নিয়মিত কাজ। ওরা তিনজন খেলার সাথী; এভাবেই ওরা বড় হয় একসাথে।

আলাল লেখাপড়ায় ভাল মেধাবী। তড় তড় করে গ্রামের স্কুল থেকে ম্যাট্রিক পাশ করে মফস্বল শহরের কলেজে ভর্তি হয়। কলেজের পরিক্ষায়ও আলাল ভাল রেজাল্ট করে। অবশেষে চিটাগাং উনিভার্সিটিতে ভর্তি হয়। শেফালীর ভাই আলম চিটাগাং স্টীলমিলে চাকুরী করে। সেই সুবাদে মামার উপর আলালের দেখাশুনার ভার। আলাল লেখাপড়ায় বরাবরই মনোযোগী। যথারীতি সে ভার্সিটির শেষ বর্ষে উঠে আসে। মাঝে মাঝে ভার্সিটির ছুটিতে বাড়ী আসে। এ বাড়ী ও বাড়ী করে পুরো গ্রাম ঘুরে বেড়ায়। ছোকানু'দের বাড়ী যায় সে। ওর সাথে দেখা হয়, ছোকানুরও এখন বড় হয়েছে। ছেলেবেলার খেলার সাথী এখন আর সেই ছোট্র মেয়ে ছোকানুর নেই। সে এখন কিশোরীর গণ্ডি পেরিয়ে যুবতীর চৌহদ্দীতে পা রেখেছে। আলাল আর ছোকানু ওরা একে অপরকে ভালবাসে। ওদের মধ্যে কথাবার্তা খুব কম হয়। ঐ যে গান আছে না – "গভীর হয় গো যেখানে ভালবাসা, মুখে তো সেখানে থাকে না কোন ভাষা" । সেবার যখন ভার্সিটি'র ছুটিতে বাড়ী এসেছিলো, ছোকানুর আলালকে আড়ালে পেয়ে একটুখানি কথা বলেছিল-
"দেশের অবস্থা ভাল না, খালি আন্দোলন, জ্বালাও পোড়াও মারামারি, তুমি সাবধানে থাইকো আলাল ভাই, তোমার জন্য আমার ভীষণ ভয় হয়"। উত্তরে আলাল মুচকি হেসে শুধু বলেছিলো; তুই শুধু শুধু ভয় পাস ছোকানু, আমার কিচ্ছু হবে না। আরো বলেছিল; জানিস, আন্দোলন কি সাধে হয়। অনেকটা আক্ষেপের সুরে, "আর কতোকাল আমরা মাথা নিচু কইরা থাকবো বল। আর কত শোষণ নিপীড়ন সহ্য করবো। আন্দোলন তো হবেই। দেখ- আমরা বাঙ্গালীরা পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ট জনগোষ্ঠী। অথচ চাকূরী বাকুরী সব ক্ষেত্রে আমরা আমরা বঞ্চিত। খেয়াল কর, পাকসেনা বাহিনীতে আমাদের বাঙ্গালী অফিসার নেই বললেই চলে। অথচ ১৯৬৫ সালে'র পাক-ভারত যুদ্ধের সময় আমাদের বাঙ্গালী জোয়ান ভাইয়েরাই ওদের পশ্চিম পাকিস্তান রক্ষার

জন্য কি যুদ্ধটাই না করেছিল। বুকে মাইন বেঁধে ট্যাংকের নিচে ঝাপিঁয়ে পড়ে ইন্ডিয়ার ট্যাংকবহর ধ্বংস করেছিল। তানা হলে ওদের পশ্চিম পাকিস্তানের মানচিত্রই হয়ত পাল্টে যেতো। আলাল হাসতে হাসতে আরও বলেছিল; "জানিস- এই আন্দোলন তো নূতন একটা দেশ জন্মের প্রসব বেদনা মাত্র"। ছোকানুর লজ্জাবনত মুখে মুচকি হেসে সড়ে পড়ে, এর জবাব দেয় না। ছোকানুর জানে আলাল মেধাবী এবং সব ব্যাপারে জ্ঞান রাখে। তার কথার উপর আস্থা রাখে সে। গ্রামের লোক আলালকে দেশ নিয়ে, স্বাধীকার আন্দোলন নিয়ে নানারকম প্রশ্ন করে। আলাল হাসিমুখে সবার প্রশ্নের জবাব দেয়। সুন্দর করে স্বাধীনতার স্বপক্ষে যুক্তি তুলে ধরে। সবাইকে স্বাধীকার আদায়ের আন্দোলনে একযোগে কাজ করার পরামর্শ দেয়। আলাল- দেশ প্রেমিক উদীপ্ত এক তরুণ যুবক চোখে মুখে যার স্বাধীন বাংলাদেশের স্বপ্ন। আলাল ও ছোকানুরের ভালবাসা এখন দুই পরিবারের কাছে স্বীকৃত। আলালের ভার্সিটি ফাইনালের আর মাত্র কয়েক মাস বাকী। দুই পরিবারের মধ্যে ওদের বিয়ের কথাবার্তা মোটামুটি পাকা; আলাল ফাইনাল পাশ করলেই ওদের বিয়ে হবে। এনিয়ে ছোট ভাই বেলাল মাঝে মাঝে ছোকানুরকে টিপ্পনি কাটে। ছোকানুর অনুরাগের সুরে মা শেফালী'র কাছে অনুযোগ করে; শেফালী শুধু হাসে, কোন প্রতিবাদ করে না। আলাল আর ছোকানু'রের বিবাহ বন্ধন যেন এখন একটা সময়ের ব্যাপার মাত্র।

এরিমধ্যে বেজে উঠে স্বাধীনতার রনদামামা। গর্জে উঠে পাকবাহিনীর মেশিনগান, জ্বলে উঠে পুরো দেশ। ১৯৭১'র সালের ২৫ শে মার্চ- সেই কালো রাত নিয়ে এলো শেফালী'র জীবনে আর এক কালো অধ্যায়। সারা দেশ জুড়ে ছড়িয়ে পড়লো যুদ্বের দাবানল। সাড়া দেশে পাকবাহিনী ঝাঁপিয়ে পড়লো নিরস্ত্র সাধারন মানুষের উপর। এলোপাথাড়ী গুলি করে হত্যা করলো হাজার হাজার মানুষ। ঢাকা চিটাগাংসহ বড় বড় শহরে পাকবাহিনী ঢুকে পড়লো ভার্সিটির হলে। এলোপাথারী গুলি করে হত্যা করলো অগণিত ছাত্রছাত্রী। লাঞ্ছিত করলো হাজার হাজার মা বোন। বন্দর নগরী চিটাগাং, কালুর ঘাট এবং পতেংগায় পাকিস্তানী মিলিটারিরা বোমা মেরে বহু শিল্প কারখানা জাহাজ ধ্বংস্ব করেলো। ভাই আলম আর ছেলে আলালের কোন খোঁজ নেই। সে এক বিভীশিকাময় দিন তখন। এরই মধ্যে চিটাগাং থেকে পায়ে হেঁটে বহু মানুষ গ্রামে ফিরে এলো। আলমের সহকর্মী সুজন একই মিলে কাজ করতো। কোন রকমে জীবন নিয়ে সে বাড়ী ফিরেছে। সে আলমের কোন সংবাদই দিতে পারলো না। এরই মধ্যে কেটে গেল মাসাধিক কাল। কিন্তু শেফালী তার ভাই এবং ছেলের কোন সংবাদই পাচ্ছিলো না। প্রায় দুই মাসের মাথায় লোকমুখে খবর পাওয়া গেলো আলম পাক বাহিনীর চিটাগাং স্টীল মিল আক্রমনের প্রথম লগনেই হানাদারদের বুলেটের আঘাতে প্রাণ হারায়। কিন্তু আলালের হদিস কেউই দিতে পারলো না। কেঁদে বুক ভাসায় শেফালী আর বিধাতার কাছে প্রার্থনা করে সন্তানের মঙ্গলের জন্য। কত স্মৃতি কত স্বপ্ন আলালকে ঘিরে। শিশুকালে বাপ হারিয়ে মায়ের আদরে বড় হয়েছে আলাল। বাবার আদর কি জিনিস তার জানা নেই, সেই ছেলে কিনা আজ বর্বর এক হানাদার বাহিনীর চাপিয়ে দেয়া যুদ্ধের কারনে নিখোঁজ। অনেক প্রতিক্ষার অবসান ঘটিয়ে যুদ্ধ শুরুর প্রায় তিন মাস পর হঠাৎ আলালের একখানা চিঠি পাওয়া গেলো। সে লিখেছে মাকে- সে ভাল আছে। আরও জানিয়েছে; ২৫ মার্চের রাতে আলাল চিটাগাং ছেড়ে পালিয়েছে। তারপর পায়ে হেটে সীমান্ত পাড়ি দিয়ে ওপাড়ে গিয়ে প্রাণ বাঁচিয়েছে। সে তার মামার কোন খবর কিছই জানেনা। আন্তর্জাতিক সংস্থা রেড ক্রসের মাধ্যমে গোপনে এ চিঠিখানা পাঠিয়ে আলাল মাকে আস্বস্থ করেছে যে সে বেঁচে আছে।

আলালের চিঠি পেয়ে শেফালী'র ধড়ে যেন প্রান ফিরে এসেছিল সেদিন। এরপর থেকে শেফালীর শুধু প্রতিক্ষার পালা-কবে যুদ্ধ শেষ হবে? ছেলে কবে বাড়ী ফিরবে? নাকি ফিরবেই না? যদি যুদ্ধে আলালের কিছু হয়? মায়ের মন- কত অজানা আশংকা উঁকিজুকি দেয় অহরনিশি। শেফালী'র দিন কাটে চোখের জলে আর নামাজের পাটিতে। রাতের পর রাত বিনিন্দ্র রজনী কাটিয়ে চোখের কোনে কালো দাগ পড়ে গেছে শেফালীর। ছোকানুর প্রায় রোজই আসে শোকার্ত শেফালী'কে দেখতে, পাশে বসে সান্তনা দেয়। নিজেও লোক চক্ষুর আড়ালে প্রানের মানুষটার জন্য চোখের জল ফেলে। এর মধ্যে কেটে গেলো আরও চার পাঁচ মাস। মাসে মাসে এখন শ্রাবন মাস। ভরা বাদলের প্যাঁকে বর্বর বাহিনী মুক্তি বাহিনীর কাছে নাকানী চুবানী খাচ্ছে। কোনঠাসা হয়ে পড়েছে পাকবাহিনী। মুক্তিবাহিনীর বিজয়ের বার্তা স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র আগরতলা থেকে নিয়মিত প্রচারিত হচ্ছে। যুদ্ধের বোধ হয় আর বেশী বাকী নেই। এ সময় হঠাৎ আলালের আরও একখানা চিঠি পাওয়া গেলো। আলাল জানিয়েছে সে ভাল আছে এবং মুক্তিবাহিনীতে যোগ দিয়ে দেশের জন্য লড়াই

করে যাচ্ছে। মাকে সে জানিয়েছে দেশ অচিরেই স্বাধীন হচ্ছে এবং দেশ স্বাধীন হলেই সে বাড়ী ফিরবে। শেফালি আজ অনেক খুশী ছেলের ঘরে ফেরার বার্তা পেয়ে। অনেক আশায় বুক বেঁধে বসে আছে সে। একদিকে ওয়াজেদ শানার শরীর ধীরে ধীরে ভেঙ্গে পড়ে। পুত্র আলমকে হারানোর শোক এবং অন্যদিকে চিরদুঃখীনি মেয়ের একমাত্র আশার প্রদীপ নাতি আলালের অনিশিচত জীবনের আঘাত সইতে না পেরে বেশ ক'মাস ধরে বিষণ্নতায় ভূগছিলো। জীবনের বেঁচে থাকার আনন্দ হারিয়ে ফেললো সে। সারাদিন চুপচাপ বসে থাকে এখানে ওখানে। খাওয়া দাওয়া নেই বললেই চলে, ধীরে ধীরে অসুস্থ হয়ে পড়ে ওয়াজেদ শানা। এভাবেই সামান্য একটু অসুখে পড়ে শ্রাবনের এক কাক ডাকা ভোরে সে চলে যায় পরপারে। ছায়া দেবার মত আর কেউ রইলো না শেফালীর জীবনে। মামাত ভাই লালুমিয়া কাগুজী পাশে এসে দাঁড়ালেন। শেফালী তার বয়সে বড়, সে শেফালিকে বুবু বলেই ডাকেন। খোঁজ খবর করেন মাঝে সাঝে। বেলাল মফস্বল কলেজ থেকে আই পাশ করে এখন বাড়ীতে। একে উঠতি যুবক, তার উপর গ্রামে কানাঘুষা ভাই তার ভারতে। তাই বেলালের জীবনও আজ বিপন্ন, হুমকির মুখে। শংকিত না জানি কখন মিলিটারীদের দোষর রাজাকাররা তাকে ধরে নিয়ে যায়। সারাদিন লুকিয়ে থাকে বনে বাদরে, রাতেও বাড়ী থাকে না মিলিটারীদের ভয়ে। ছোকানুরেরই এখন এই বেদনাক্লিস্ট শেফালী'র একমাত্র দেখাশুনার দায়িত্বে।

বছর গড়িয়ে ১৯৭১'এর ডিসেম্বর মাস। ১৬ ডিসেঃ দেশ স্বাধীন হলো। হানাদার বাহিনী আত্মসমর্পণ করলো, গ্রামছাড়া মানুষগুলো ধীরে ধীরে আবার গ্রামে ফিরতে শুরু করলো। একটা স্বস্তির নিশ্বাস পড়লো সারা দেশে। কিন্তু মা শেফালী'র? না, তার স্বস্তি নেই- তাঁর অতি আদরের দুলাল আজো বাড়ী ফেরেনি। ১৯৭২ সালের ২৬ মার্চ এসে গেলো, স্বাধীন দেশের প্রথম স্বাধীনতা দিবস পাড় হলো। অথচ আলালের আজও কোন হদিশ নেই। কি হলো তাহলে আলালের? শেফালী'র প্রতাশা ছিল- যুদ্ধ শেষ হলেই আলাল বাড়ী ফিরবে। যুদ্ধ শেষ হযেছে আজ তিন মাস। কিন্তু না, আলাল তো এখনো ফিরছে না। শেফালীর সকল আশার প্রদীপ আজ আশা নিরাশার দোলাচলে নিঁভু নিঁভূ কবছে। কি হলো তা হলো আলালের? কেউ কিছু ঠাহর করতে পারছে না। খুঁজে বেড় করার মতোও কেউ নেই শেফালির, চোখের জলের অথৈ সাগরে ভাসছে শেফালী। এদিকে ছোকানুরের বাবা মা মেয়ের বিয়ে দেবার তাগিদ অণূভব করছেন। এখান ওখান থেকে ভাল ভাল বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে ঘটক আসতে শুরু করেছে। গাঁও গ্রামে আঠারো উনিশ বছরের মেয়ের বিয়ে হয়নি এনিয়ে কথা হয়। আলালের মত ছেলের জন্য ছোকাণুরের বাবা মা অপেক্ষায় ছিলেন, আরও থাকতে আপত্তি নেই। তবে তাঁরও এর একটা মেয়াদ আছে। এখন জুন-জুলাই মাস ১৯৭২। গ্রামে রটনা হয়ে মুখে মুখে ফিরছে- "আলাল আর বেঁচে নেই; যুধ্দ শেষ হয়েছে আজ প্রায় ছয় সাত মাস। বেঁচে থাকলে নিস্চয়ই এতোদিনে বাড়ী ফিরতো"। অবশেষে সব অপেক্ষার অবসান ঘটিয়ে ছোকানুরের বাবা একদিন বিনয়ের সাথে বুবু শেফালী'র কাছে কথা পাড়লেন। শেফালীকে বললেন সে সত্বরই ছোকানুরের বিয়ে দিতে চান। এত ভাল ভাল পাত্র সে এক অজানা আশায় হাত ছাড়া করতে পারেন না।

ছোকানুরের ঠোট কাঁটা মামুজান তো মুখের উপরে বলেই ফেললেন; "আলাল নিশ্চয়ই বেচেঁ নেই-বেচেঁ থাকলে, বেঁচে থাকলে নিশ্চয়ই এতদিনে বাড়ী ফিরতো"। তারপর অনেক আলোচনা ও বোঝাপড়ার পর দুই পরিবার সিদ্ধান্তে উপনীত হলো- তাহলে বেলালের সাথেই ছোকানুরের বিয়ে হোক। ছোকানুরও কিছু ভেবে উঠতে পারছিলো না। সেই বা কিভাবে তার অতি প্রিয়জন পুত্রহারা বেদনাকিল্স্ট ফুফুটিকে এভাবে একা ফেলে অন্য কোথাও অজানা অচেনা ঘরে চলে যাবে। সে যে শেফালি ফুফুকে অনেক ভালবাসে। বেলালেরও ঘোর আপত্তি ছিল এ বিয়েতে- "কি করে সে তার আপন বড় ভাইয়ের হৃদয়ের মানুষটিকে বিয়ে করবে? কি বলবে ভাই যদি কোনদিন ফিরে আসে"? পরে নানা মুনির নানা কথায় এবং নিকটজনদের পরামর্শে বেলাল এ বিয়েতে রাজী হয়। অবশেষে আলালের জন্য সকল প্রতীক্ষার অবসান ঘটিয়ে ১৯৭২ সালের আগস্ট মাসের প্রথম সপ্তাহে ভাল একটা দিন দেখে বিনা ধুমধামে বেলাল আর ছোকানুরের বিয়ে হয়ে যায়। এরপর কেটে যায় আরও কয়েক মাস। ১৯৭২ সালের অক্টোবর মাস। আলালের বেঁচে থাকার আশা সবাই রিতিমতো ছেড়েই দিয়েছে সবাই। আশ্বিনের ভরা বাদলে পুরো গ্রাম যখন পানিতে সয়লাব, খালবিল ডোবা নালা যখন কানায় কানায় পূর্ণ, গ্রামের পায়ে হাঁটা মেঠো পথখানা যখন গরুর গাড়ীর চাকায় জায়গায় জায়গায় গর্ত হয়ে রিতিমত খালে রূপান্তরীত হয়েছে; এমনই বর্ষনমুখর এক প্রড়ন্ত বিকেলে মেঘলা আকাশ আর ঝড়ো হাওয়া মাথায় নিয়ে কে যেন একজন ক্রেসে ভড় করে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে ওয়াজেদ শানার বাড়ীর দিকে আসছে।

---

মুখ ভর্তি তার দাঁড়ি গোঁফ, পড়নে তার আলু থালু বেশ। দেখে চেনার কোন উপায় নেই কে সে? কে সেই যুবক?

সে আর কেউ নয়; সে এই রসুলপুর গ্রামেরই ওয়াজেদ শানার নাতি এবং শেফালীর আদরের দুলাল- আলাল। সে যুধ্দাহত মুক্তিযোধ্দা বীর প্রতিক আলাল। সে আজ এই বাদলা দিনে ক্রেসে ভর করে গ্রামে ফিরেছে। সেদিনের সেই সুদর্শন ভার্সিটির মেধাবী সাহসী যুবক আলাল আজ পঙ্গু। যুদ্ধ যখন প্রায় শেষ; আলাল সহযোদ্ধাদের নিয়ে সীমান্ত অতিক্রম করে দেশের ভিতরে ঠুকে পড়ে। বিভিন্ন জায়গায় পাকবাহিনীর সাথে সম্মুখ সমরে লিপ্ত হয়; পাকবাহিনীর ভীত নড়বড় করে দেয়। স্বাধীনতার যুদ্ধের তখন প্রায় শেষ। এমনই এক যুদ্ধে পাক বাহিনীর পুতে রাখা মাইনে পা দিয়ে মারাত্মকভাবে আহত হয় আলাল। উরু সমেত উড়ে যায় তার ডান পা এবং মাইনের স্প্লীন্টার এসে আঘাত করে তার বুকে এবং মাথায়। সাথে সাথে তাকে নিয়ে যাওয়া হয় মুক্তিযোদ্ধা ফিল্ড হাসপাতালে। সেখানে সে কয়েকদিন অজ্ঞান হয়ে পড়ে ছিল। অবস্থার একটু উন্নতি হলে তাকে নিয়ে যাওয়া হয় সীমান্তের ওপাড়ে বড় এক হাসপাতালে। এভাবেই প্রানে বেঁচে যায় আলাল। আঘাতের ক্ষত অতি গুরুতর হওয়ায় এবং পড়ে তাতে ইনফেকশন হওয়ায় আলালের চিকিৎসায় অনেকটা সময় লেগে যায়। হাসপাতালে বসে সে মাকে একটি চিঠি দিয়েছিল তার অসুস্থতার কথা জানিয়ে। কিন্তু ভাগ্যের কি নির্মম পরিহাস, সে চিঠি শেফালী'র কাছে পৌছায়নি। অনেকটা সময় সে পড়ে ছিল সীমান্তের ওপাড়ের হাসপাতালে। তারপর ধীরে ধীরে আলাল সুস্থ হয় এবং তার উরুতে লাগানো হয় কৃতিম পা। এভাবেই ক্রেসে ভড় করে আলালের বাড়ী ফেরা।

সে বাড়ী ফিরেছে ঠিকই, কিন্তু সেই বাড়ী আজ আর সেই বাড়ী নেই; বদলে গেছে সেই বাড়ী চিরত্বরে আলালের জন্য। ছেলেকে পেয়ে মা শেফালি বুকে জড়িয়ে ধরে অঝোরে কেঁদেছে। ভিতর ঘরে ছোকানুর অচেতন হয়ে পড়েছিল সেদিন। বেলালও ভাইকে জড়িয়ে কেঁদেছে বহুক্ষণ। পুরো বাড়ী লোকে লোকারন্য। গ্রামের লোকজন আলালের বাড়ী ফেরার খবর শুনে দেখতে এসেছে। সবাই চলে যাবার পর সব কিছু পরিস্কার হয় আলালের কাছে। ছোকানুর তাদের বাড়ীতে কিন্তু সামনে আসছে না। সে জানতে পারলো তার প্রাণপ্রিয় ছোকানুর আজ আর তার নেই; সে আজ তারই ছোট ভাই বেলালের স্ত্রী। সব জেনে আলাল নিথর হয়ে বসে ছিল সারাটা বিকেল; মুখে তুলে নেয়নি সে কিছুই।

দিনের শেষে রাত এলো। বহু রাত অবদি মা ছেলে শুয়ে বসে অনেক কথা হলো। এ কথা সে কথা অনেক কথা, যুদ্ধের কথা। কিন্তু কিছুতেই বলতে পারছে না শেফালী তার ছেলেকে- কিভাবে বেলাল আর ছোকানুরের বিয়ে হলো। বার বার চেষ্টা করেও পারেনি শেফালী। অবশেষে ক্লান্তিতে অবসগ্ন হয়ে কখন যেন ঘুমিয়ে পড়েছিলো সে। এরি ফাঁকে সবার অগচোরে রাতের আঁধারে আলাল তার আশৈশবের লালিত আবাসভূমি রসুলপুর ছেড়ে চির দিনের জন্য বিদায় নিল। কেঊ দেখেনি তার চিরপ্রস্থানের সেই দৃশ্য শুধু গুটিকতেক নিশাচর পাখী ছাড়া। বীর মুক্তিযোদ্ধা আলাল যুদ্ধ করে দেশ জয় করেছে ঠিকই, কিন্তু নিজ নিয়তির যুদ্ধে হেরে গেছে সে। প্রাণের প্রিয় ছোকানুরকে হারিয়ে সে আজ নিস্বঃ। গ্রাম থেকে চিরবিদায় নিয়ে অজানার পথে পাড়ি জমায় সে। কোথায় গেছে কেউ জানে না, কেঊ আর কোনদিন কোথায়ও দেখেনি আলালকে। আলালের গ্রাম থেকে চিরপ্রস্থানের কয়েক মাসের মাথায় শেফালীও পুত্রশোক সহ্য করতে না পেরে চলে যায় পৃথিবী ছেড়ে।

আঁতুড় ঘরে মা হারা শেফালী মাত্র পচিশ বছর বয়সে বিধবা হয়ে একমাত্র সন্তানের মুখের দিকে চেয়ে একাকী কাটিয়েছে বাকীটা জীবন - শুধু এতটুকু সুখের আশায়। কিন্তু সেই সুখ কোনদিনই ধরা দেয়নি শেফালীকে, সেই সুখ "অধরাই" রয়ে গেছে চির দুঃখিনী শেফালীর জীবনে।